দৈনিক জনকণ্ঠ | প্রথম পাতা | এপ্রিল ১৬ সোমবার

নববর্ষে রমনা বটমূলে মৌলবাদী বোমা হামলায় হত ৯

রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে নৃশংস বোমা হামলার খণ্ডচিত্র ঃ বাঁ থেকে—ছায়ানটের বর্ষবরণ সঙ্গীত, মঞ্চের নিকট বোমা বিস্ফোরণ, নিহত স্বজনদের আহাজারি, ঢাকা মেডিক্যালে আহতদের পাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, নিহতদের দেখতে মর্গে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া এবং ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী —জনকণ্ঠ

কামরুল হাসান যশোরের উদীচী ট্র্যাজেডির রেশ মিলাতে না মিলাতেই প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে রাজধানী ঢাকায় নববর্ষের সকালে। বর্ষবরণ উপলক্ষে প্রায় ৪০ বছরের ঐতিহ্য অনুযায়ী রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠান চলাকালে এক নৃশংস বোমা হামলায় ৯ জন নিহত এবং ২৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ছায়ানট ট্র্যাজেডির দায়দায়িত্ব কেউ স্বীকার না করলেও এটি বাঙালী সংস্কৃতির চেতনাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাজ বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশের আইজি বলেছেন, এটি অন্তর্ঘাতমূলক বোমা হামলা, মৌলবাদী ও বাংলাদেশবিরোধীরা এটা ঘটিয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেন, আহত-নিহতদের কয়েকজন এসব বোমা বহন করছিল। এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এখন পর্যন্ত স্বাধীন নামের এক যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। নিহতদের মধ্যে ৭ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে ৯ জনকে সিএমএইচএ এবং ১ জনকে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালে স্থানান্তর করা হয়। এদের দু'জনকে ঘটনার সাথে জড়িত মনে করে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন।

নববর্ষের প্রথম দিনে রাজধানীর রমনার সবুজ প্রান্তর পরিণত হয়েছিল লাখো মানুষের মিলনমেলায়। বাঙালী জাতির প্রাণের এই উৎসবে যোগ দিতে খুব সকাল থেকেই মানুষের ঢল নেমেছিল রমনায়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে গত ৪০ বছর ধরে ছায়ানট আয়োজন করে আসছে বর্ষবরণের প্রধান অনুষ্ঠান। প্রতি বছরই রমনার বটমূলে এর আয়োজন করা হয়। এবারের অনুষ্ঠানও হয়েছে সেই একই ধারাবাহিকতায়। রমনার বটমূলের এই আয়োজনে ছিল বেশ শক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মঞ্চ তৈরি থেকে শুরু করে সবকিছুই করা হয় নিরাপত্তার সাথে। আগের দিন মঞ্চ তৈরির পর থেকে পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে রাখে। রাতের বেলা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানো হয় সর্বত্র। ডগ স্কোয়াডের এক দল কুকুর রাতে বোমাসহ বিস্ফোরকের সন্ধান করে। এ রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সকালে শুরু হয় বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। সকালে যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের ঢুকতে হয় সারিবদ্ধভাবে। অনেকের ব্যাগও পুলিশ খুলে দেখে। এরপর লোকজন খুব শান্তভাবে অনুষ্ঠানস্থলে বসেন। অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হচ্ছিল বিটিভিতে। টিভিতে সম্প্রচারের জন্য পুরো আয়োজন ছিল ওই এলাকায়। রমনা রেস্তরাঁর অদূরে টিভির ওবি ভ্যান রেখে মঞ্চের তিন দিকে চারটি ক্যামেরা বসিয়ে চলছিল টিভির সম্প্রচার। মূল মঞ্চটি ছিল রমনার বট গাছটিকে ঘিরে। বিশাল মঞ্চটি গাছের একেবারে গোড়া থেকে শুরু হয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে। মঞ্চের সামনে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছিল নিরাপত্তার কারণে। বাঁশের ধার ঘেঁষে তিন দিকে মানুষের বসার ব্যবস্থা। সম্প্রচারের ঝামেলা হতে পারে বলে মঞ্চের সামনের দিকের লোকজনকে উঠতে দেয়া হচ্ছিল না। সেখানে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করছিলেন সবাই। সকাল সাড়ে ছ'টায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানটি তখন শেষ পর্যায়ে এসেছে। ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৮টা কয়েক মিনিট। ফেন্সী নামের এক শিল্পী পরিবেশন করছিলেন সেই বিখ্যাত গানটি– একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লীজননী।

জনপ্রিয় এই গানটির তালে তালে অনেকে হাত-পা দোলাচ্ছিলেন। কেউবা বসেছিলেন বেশ আয়েশ করে। গানটি তখন শেষ পর্যায়ে এসেছে, হঠাৎ মঞ্চের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় শিল্পীর গান। তখনও কেউ কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। শব্দ শুনে সবাই মনে করেছিলেন সাউন্ড সিস্টেমে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক নজরে হতচকিয়ে যায় সবাই। কিছুক্ষণ পর একজন ঘোষক মঞ্চে উঠে বলেন, আপনারা বসুন, আমাদের অনুষ্ঠান চলবে। এই ঘোষণার সাথে সাথে দেখা যায় বোমা বিস্ফোরণের ধোঁয়া। ধোঁয়ার মধ্যে মানুষের দৌড়াদৌড়ি। যে যেদিকে পারছে সরে যাচ্ছে। এর মাঝে আহত-নিহতরা পড়ে আছে মঞ্চের অদূরে। সেখানে কয়েকজনের শরীরে রক্তের দাগ। এক জন পড়ে ছটফট করছে। তাদের শরীর থেকে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা। একজন অভিনেত্রী এসব দেখে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা এসব দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায় টিভির সম্প্রচার। সবাই বুঝতে পারেন এই নৃশংস বিস্ফোরণের বিষয়টি। বিস্ফোরণের পর ভয়ে সকলেই মঞ্চের পাশ থেকে চলে যান। এক মুহূর্তে ওই এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। শিশু-মহিলাসহ সবাই ছুটতে থাকেন নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। মঞ্চের পাশে এগিয়ে গিয়ে দেখা যায়–মঞ্চ থেকে ডান দিকে ১৫/২০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঘটেছে বিস্ফোরণের ঘটনা। বিস্ফোরণের পর ৭ জন নিহত হয় অকুস্থলেই। আহত হয় ২৫ জনের বেশি। অকুস্থলে দেখা যায় একজনের দেহের ওপর পড়ে আছে আরেকজন। দু'জনের শরীর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। তখনও পুড়ছিল পরনের কাপড়ের অংশ। বিস্ফোরণের কারণে নিহতদের মধ্যে দু'জনের পেট থেকে ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে, একজনের মাথার খুলি উঠে গেছে। অকুস্থলে পড়ে আছে তার মাথার মগজ। দু'জনের হাতের কব্জি উড়ে গেছে। নিহতের দু'জন ছিল লুঙ্গি পরা, ৫ জন প্যান্ট পরা অবস্থায়। এদের সকলের বয়স ২০-৩৫-এর মধ্যে। বিস্ফোরণের পরপরই আহতদের হাসপাতালে নেয়ার তৎপরতা শুরু হয়। রমনা থানা-পুলিশের গাড়িতে করে আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিক্যালে। সেখানে আরও দু'জন মারা যায়। আহতদের মধ্যে ২৫ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকালে এই বিস্ফোরণের পর নিহতদের লাশ ত্রিপল দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখা হয়। হতাহতের খবর শুনে অকুস্থলে ছুটে আসেন পুলিশের আইজি নুরুল হুদা, মহানগর পুলিশের কমিশনার মতিউর রহমান, ডিসি-ডিবি আবদুল হান্নান, ডিসি দক্ষিণ আব্দুল কাশেমসহ অনেক পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশের দেয়া খবরে এ্যাম্বুলেন্স আসে লাশ নিতে। সকাল পৌনে নয়টা পর্যন্ত ৭টি লাশ পড়ে থাকে রমনার বটমূলে। পুলিশের গাড়িতে লাশ উঠানোর সময় হঠাৎ আরও একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণে পুলিশের এসআই শরিফুলসহ দু'জন আহত হন। তাঁকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। এদিকে বটমূলের এই বিস্ফোরণের খবর তখনও রটেনি পুরো রমনা প্রাঙ্গণে। বটমূলের লেকের ওপারে তখনও বাজছিল চড়া ভলিউমে দেশের গান। এপারে বটগাছের নিচে তখন পড়ে আছে লাশ আর ছোপ ছোপ রক্তের দাগ, মানুষের মাথার মগজ, মাথার চুল, ফেলে যাওয়া স্যান্ডেল-জুতা। এভাবেই শেষ হয় নববর্ষের ছায়ানট ট্র্যাজেডি।

রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের পর পরই অকুস্থলে ছুটে আসেন সেনা বোমা বিশেষজ্ঞ, পুলিশ কর্মকর্তা ও সিআইডির বিস্ফোরক তদন্ত টিম। বিস্ফোরণের পর পুরো এলাকায় শুরু হয় সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক অনুসন্ধান টিমের তৎপরতা। তারা সেখানে নতুন আর কোন বিস্ফোরক খুঁজে পাননি। সেনা কর্মকর্তারা সেখান থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেন। সেগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। অকুস্থলে পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান জানান, যারা এ সংস্কৃতি লালিত হোক তা চায় না তারাই এই বোমা হামলা চালিয়েছে। তিনি বলেন, ঘটনার তদন্ত হলে সবকিছু বেরিয়ে পড়বে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে বলেন, যশোরে উদীচীর সমাবেশে বিস্ফোরিত বোমার সাথে এই বোমার বেশ মিল রয়েছে। মঞ্চের একই কৌণিক দূরত্বে এই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছে। তবে উদীচীর বোমাটি মাটিতে পোঁতা ছিল আর এটি বহন করে নিয়ে যাওয়া হযেছে। বোমা বিস্ফোরণের পর সেখান থেকে পাওয়া গেছে একটি লোহার পাইপের অংশ, যেটি ব্যবহার করে বোমা বানানো হয়েছিল। পাইপের সাথে রয়েছে ছেঁড়া তার । তাতে ব্যাটারি সংযোগোর ব্যবস্থাও রয়েছে। পাওয়া গেছে কয়েক টুকরা বিচ্ছিন্ন কাপড় ও একটি মানিব্যাগ, সাথে কিছু কাগজপত্র। কাপড়গুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। পাওয়া লোহার পাইপের বোমার ভগ্নাংশর ধরন দেখে পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, কেউ এটি বহন করছিল।

ডিসি-ডিবি আবদুল হান্নান বলেন, তাঁদের ধারণা বিশেষ কোন গোষ্ঠী এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তারা বোমাটি বিস্ফোরণের জন্য আগে থেকেই মঞ্চের পাশে বসে ছিল। তাঁর ধারণা, হয়ত সুযোগ বুঝে বোমাটি ছুড়ে দেয়া হতো মঞ্চের ভিতর। কিন্তু সে সময় আসার আগেই বাহকের হাতে সেটি বিস্ফোরিত হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণে যে লোকটির নাড়িভুঁড়ি বের হয়েছে তাকেই বোমার বাহক বলে সন্দেহ করা হয়। পরে লাশ দেখে পুলিশ কর্মকর্তারা শনাক্ত করেন নিহত ব্যক্তির নাম জসিমউদ্দিন। এই যুবকটিই বোমা বহন করেছে। বিস্ফোরণে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গেছে। তার সাথে রয়েছে তিন বন্ধু মিজানুর রহমান স্বাধীন, মাহাবুব ও ইব্রাহিম। এরা সকলেই মাতুয়াইলের একটি মাদ্রাসার মেসে থাকে। তাদের মধ্যে একজন ছাত্রশিবির কর্মী রয়েছে। দু'জন মাদ্রাসায় পড়ে। একজন ঢাকা কলেজের ছাত্র। ধারণা করা হচ্ছে, এই চারজনে ঘাতক বোমাটি বহন করে এনেছিল। তারা কোন মৌলবাদী গোষ্ঠীর হয়ে এ কাজ করেছে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন। এ কারণে পুলিশ আহত অবস্থায় মাহাবুব ও ইব্রাহিমকে আটক করেছে। এদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মাতুয়াইল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে স্বাধীনকে। তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পুলিশ বলেছে, নিহতদের কয়েকজন লুঙ্গির উপরে প্যান্ট পরেছিল। তাঁদের ধারণা, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এ কাজ করেছে। এদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

পুলিশের আইজি নুরুল হুদা জনকণ্ঠকে বলেছেন, এটি অন্তর্ঘাতমুলক কর্মকাণ্ড। তিনি বলেন, তদন্ত হলেই প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হবে। আইজি বলেন, এ ঘটনা তদন্ত করবে ঢাকা মহানগর পুলিশ। তবে একাধিক সূত্র বলেছে, এই ঘটনাটি কোন মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাজ। তারা দেশের স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে এ কাজ করেছে।

বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত চার জনকে পুলিশ শনাক্ত করেছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট রমনা বটমূলে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত চার জনকে এখন পর্যন্ত পুলিশ শনাক্ত করেছে। এদের মধ্যে একজন জসীম ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেছে। দু'জন মাহবুব ও ইব্রাহীম মারাত্মক আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে সিএমএইচে। ঢাকা কলেজের ছাত্র স্বাধীন রিমান্ডে রয়েছে ডিবি-পুলিশের কাছে। ডিবি শনিবার রাতেই স্বাধীনকে গ্রেফতার করে এবং বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছে। বোমা হামলার ঘটনা দিয়ে ইতোমধ্যে দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার তদন্তকারী সংস্থা ডিবির ডেপুটি কমিশনার আবদুল হান্নানের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, গ্রেফতারকৃতরা একজন নিজেকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী বলে দাবি করেছে। তবে শিবিরের পক্ষ থেকে এই তথ্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, তাদের সংগঠনে এসব নামে বা এ ধরনের কোন কর্মী নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম জনকণ্ঠকে বলেছেন, শনাক্তকৃত চার জনই একটি মৌলবাদী সংগঠনের কর্মী। সময় বুঝে এরা একেক ঘটনায় একেক নামে আবির্ভূত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কোটালীপাড়া জনসভায় বোমা পুঁতে রাখা, কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণ, মসজিদের ভিতরে পুলিশ হত্যাসহ সাম্প্রতিক নাশকতামূলক কাজগুলোর হোতা এই একই চক্র। দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির মদদে ও প্রশ্রয়ে এরা একের পর এক এসব ঘটনা ঘটানোর সাহস পাচ্ছে। সরকার এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ডিবি-পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া গেছে, এ পর্যন্ত শনাক্তকৃত চার জনই রাজধানীর ডেমরা এলাকার মাতুয়াইলে একটি মসজিদ সংলগ্ন মেসে বাস করত। এদের বাড়ি সমুদ্র উপকূলবর্তী পটুয়াখালী বরগুনা এলাকায়। যে ৯ জন এই ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মধ্যে আরও অন্তত তিন জন এর সঙ্গে জড়িত। পুলিশ এদের মধ্য থেকে জসীমের নাম উদ্ধার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, জসীম বিস্ফোরিত বোমাটি বহন করছিল। তার পরনে ছিল প্যান্ট, তবে নিচে ছিল লুঙ্গি। সিএমএইচে চিকিৎসাধীন মাহবুব এবং ইব্রাহীমের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ শনিবার রাতেই মাতুয়াইলের মেস থেকে স্বাধীন নামে ঢাকা কলেজের এক ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ দাবি করছে, এই স্বাধীন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী। আহত মাহবুব ও ইব্রাহীম আগে মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। এখন তারা লেখাপড়া করছে না। তারা এই মেসের বাসিন্দা এবং অদৃশ্য কোন কাজের সঙ্গে জড়িত। এদের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় পুলিশ রবিবার আর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। তবে স্বাধীন পুলিশের কাছে বেশকিছু তথ্য দিয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এই মুহূর্তে সবকিছু প্রকাশ করতে রাজি হচ্ছে না। ডিবি-পুলিশের এসি আখতারুজ্জামান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বোমা বহনকারীরা বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগুচ্ছিল। একপর্যায়ে মানুষের চাপাচাপিতে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে যায়। সম্ভবত বোমাটি বহনকারীর নাম জসীম। এদের আরও দু'জনের কাছে বোমা ছিল। যেটি পরে আহতদের উদ্ধারের সময় বিস্ফোরিত হয়। আরেকটি বোমা ছিল অক্ষত। বোমা বহনকারীরা প্যান্টের নিচে লুঙ্গি পরেছিল। পুলিশের ভাষ্যমতে, এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত কেউ লুঙ্গি পরে আসে না। এ কারণে তারা লুঙ্গির ওপর প্যান্ট পরেছিল। এ ছাড়া বোমা বহনের সুবিধার্থেও এরা লুঙ্গির ওপর প্যান্ট পরে থাকতে পারে।

বটমূলে ছায়ানটের এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় সর্বশেষ তদন্ত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা নিশ্চিত যে মৌলবাদী সংগঠন এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কোন্ সংগঠন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এরা সবাই এক। প্রয়োজনের সময় একেকজন একেক নাম ধারণ করে। অতীতের সবকটি ঘটনা এরাই ঘটিয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এদের ক্ষমতার পার্টনার বানানোর স্বপ্ন দেখিয়েছে। এ কারণে এরা এখন তালেবানী স্টাইলে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। এরা শুধু আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের শত্রু নয় দেশ ও জাতির শত্রু।

এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন? প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, যখনই মামলায় অপরাধীকে শনাক্ত করা হয় ঠিক তখনই দেশের প্রধান বিরোধী দল নিজেদের নেতা বা কর্মী দাবি করে বিবৃতি দেয়া শুরু করে। বিষয়টিকে তারা রাজনৈতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা চালায়। এ কারণে তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব

ঘটে। তবে এরা কেউ রেহাই পাবে না। বটমূলের ঘটনায় দেখেছি, এত বড় একটি ঘটনায় মানুষ আতঙ্কিত হয়নি। বরং সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। মানুষ যেভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই নাশকতা সৃষ্টিকারী এসব গোষ্ঠীকে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

বোমা হামলার ষড়যন্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে-পাকি ধারায় ফেরাতে

রেজোয়ানুল হক/মাহমুদুল ইসলাম ॥ ছায়ানট এবং উদীচী তো নয়ই, এমনকি ১১ দলীয় জোটও ক্ষমতার দাবিদার কোন রাজনৈতিক শক্তি নয়। তবুও পরপর এই তিনটি সংগঠন ও জোটের অনুষ্ঠানে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বোমা হামলার ঘটনা বিশ্লেষণ করে প্রগতিশীল সকল মহলই বলছে, স্রেফ অনুষ্ঠান পণ্ড করা অথবা সরকারকে বিপদগ্রস্ত করার মতো সাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এসব বোমা হামলা চালানো হচ্ছে না, এর শিকড় আরও অনেক গভীরে প্রোথিত। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক ঝগড়ার কারণে দেশে যে সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তারই সুযোগ নিয়ে বাঙালী সংস্কৃতি ও প্রগতিবিরোধী শক্তি দেশকে পাকিস্তানী ধারায় ফিরিয়ে নেয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এসব ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এই মতের সমর্থনে রবিবার খবর পাওয়া গেছে, একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা তাদের এদেশীয় অনুসারীদের মাধ্যমে এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর এবং উদার দেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, আওয়ামী লীগ বা বিএনপির মতো বড় রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে না– ঘটছে উদীচী, ছায়ানটের মতো প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং একই ঘরানার রাজনৈতিক জোট ১১ দলের সমাবেশে। সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম রবিবার জনকণ্ঠকে বলেন, এই ঘটনাগুলো একসূত্রে গাঁথা। এসব হামলায় নিরীহ মানুষকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, দেশে সুস্থ ধারার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার ধারা স্তব্ধ করতে ষড়যন্ত্রকারীরা ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। একের পর এক এমন ঘটনা ঘটে চললেও হামলাকারীরা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে এবং সরকার ও বিরোধী দল দু'পক্ষই এসব ঘটনাকে রাজনৈতিক পুঁজি করতে চাইছে। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা নির্মল সেন বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে নতুন চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাকেন্দ্রিক যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, তার আড়ালে যে কোন ঘটনা ঘটানো সম্ভব এবং তাই ঘটে চলেছে। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, এগুলো কোন সাধারণ ঘটনা নয় বরং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একসূত্রে গাঁথা, যার শিকড় অনেক গভীরে। তিনি বলেন, ঘটনাগুলোর চরিত্র দেখলেই বোঝা যায় গণতন্ত্র, প্রগতিশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা যাদের অপছন্দ তারাই এসব ঘটনার হোতা এবং সে কারণে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার মানুষই তাদের টার্গেট। বাসদ নেতা আফম মাহবুবুল হক বলেন, প্রগতিশীল, মুক্তচিন্তা ও সুস্থ ধারার রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মাফিয়াদের কাজের অসুবিধা হয়। সে কারণেই তারা সুস্থ ধারা ধ্বংস করতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এবং এনজিওদের সমন্বয়কারী সংস্থা 'এডাব' নেতৃবৃন্দ আরও পরিষ্কার করে এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করেছেন। ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও মহাসচিব ড. কাজী ফারুক আহমেদ রবিবার এক বিবৃতিতে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে পরিকল্পিতভাবে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। এডাব-এর চেয়ারপার্সন খুশী কবীর ও পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, পাকিস্তান আমলে এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা ও পহেলা বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাধাদানকারী ওই মহলের উত্তরসূরিরা এসব বর্বরোচিত হামলা চালাচ্ছে।

প্রগতিশীল মহলের এসব বক্তব্যই শুধু নয়, এই তিনটি ঘটনার পাশাপাশি দেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরও কয়েকটি ঘটনা মিলিয়ে দেখলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের ৮ নেতাকর্মীকে এবং সম্প্রতি সাতকানিয়ায় বোরখার আড়ালে থেকে ব্রাশফায়ারে ২ যুবলীগ নেতাকে খুন, রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটি মসজিদের ভিতর নৃশংসভাবে পুলিশ খুন– এসব ঘটনাও বর্বরতার দিক দিয়ে একই চরিত্রের। সরকারী দল আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন, ইতিহাসের অন্যতম বর্বর ঘটনায় নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের খুনীদের বিচারের হাত থেকে বাঁচাতে বিশেষ একটি মহল সচেষ্ট রয়েছে।

পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকরা বলছেন, বড় ধরনের কোন চক্রান্ত সফল করতে হলে নির্বাচনের আগের বা পরের 'ট্রানজিশন পিরিয়ড'-এর মতো নাজুক সময় খুবই উপযোগী। উদীচী ট্রাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে ছায়ানটের এবারের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনেক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়ার পরও বোমা হামলার পরিকল্পনাকারীরা আত্মঘাতী হবার মতো চরম ঝুঁকি নিয়ে এ অনুষ্ঠানে হামলা করেছে সম্ভবত নির্বাচনের আগের এই সময়কেই কাজে লাগাতে। আগামী নির্বাচন নিয়ে সংশয়ের কথা ইতোমধ্যেই বলাবলি হয়ে আসছে। এই আশঙ্কার সঙ্গেও এসব ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রাজনীতিবিদ রবিবার বলেন, কোনভাবে নির্বাচন বানচাল করে দেয়া গেলে গণতন্ত্র ও প্রগতিবিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে বলে মনে করছে এবং এখন সম্ভবত সেই চেষ্টাই চলছে।

ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না

মামুনুর রশীদ ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না। হ্যাঁ এক সময় আমরা গান গাইতে পারতাম না, আমাদের মনের কথা, প্রাণের কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। একটা শাসক ছিল যারা সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু এখন ? আমরা যখন গান গাইছি, হাজার হাজার মানুষ যখন উদ্বেলিত হচ্ছে আবেগে তখন কারা গানকে স্তব্ধ করছে? একবার নয়, একাধিকবার। যশোরে উদীচীর আসরে যখন বাউলরা গাইছিল শান্তি আর সম্প্রীতির গান। বেশিদিন হয়নি। ঢাকার রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখে আবার হামলা। রক্তাক্ত হলো শান্তির প্রাঙ্গণ, শিল্পের প্রাঙ্গণ। আমাদের জাতির যে ইতিহাসগুলো কালক্রমে প্রতিষ্ঠানে আর প্রেরণায় পরিণত হয়েছে তার মধ্যে মুখ্য দুটো জায়গা একুশে ফেব্রুয়ারি আর পহেলা বৈশাখ। জনগণ নিজের রক্ত দিয়ে তৈরি করেছে এই দু'টি দিন। আবার রক্ত দিতে হবে?

রাজনীতি?

গতকাল দু'জন শিল্পী সনজিদা খাতুন এবং মিতা হক বলেছেন, রাজনীতি কেন? কার জন্য? সনজিদা খাতুন অবশ্য আরও বলেছেন, ভোটের রাজনীতি। ভোটের রাজনীতি যে কোন ক্রিমিনালকেও জননায়কের মর্যাদা দেয়। আমাদের চোখের সামনে অহরহ এসব ঘটছে। যে রাজনীতি মানুষকে হত্যা করে, ভয় দেখায়, রাজপথকে বিঘ্নিত করে, শ্রমজীবী মানুষকে অকারণে হত্যা করে সে রাজনীতির কি প্রয়োজন আছে? এ প্রশ্ন উঠেছে উদ্বিগ্ন মানুষের কাছ থেকে। এটাও সত্য আদর্শহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন রাজনীতিই আজ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা। শোনা যাচ্ছে নানা গরম কথা। মন্ত্রীরা বলছেন। কিন্তু কোথায় নিরাপত্তা। সরকার তো সমাজকে নির্বিঘ্ন করবে, সুস্থিত করবে, কিন্তু কোথায়? মানুষের সামাজিক নিরাপত্তাও তো থাকছে না। অসহিষ্ণু সব পক্ষই।

আর এই অসহিষ্ণুতার শিকার হবে শুধুই সাধারণ মানুষ? কত দিন? কত মাস? কত বছর? কত যুগ? রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। এটাও কি ভাল লক্ষণ? রাজনীতিবিদদের জন্য খুব ভাল সংবাদ? সমাজকে তাঁরা সামাল দেবেন কিভাবে? গতরাতে বিদেশ থেকেও অনেক ফোন পেয়েছি। তারা উদ্বিগ্ন। ভেবেছে বাংলাদেশের মানুষ শোকেদুঃখে বেদনায় হয়ত বরফ হয়ে গেছে। সরকার, বিরোধী দল নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দল একসাথে বসেছে। কেউ কেউ হয়ত পদত্যাগও করেছে। এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিব্রত হতে হয়েছে। কারণ এসব তেমন কিছু হয়নি। সভা-বিবৃতি-মিছিল এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সব। কিন্তু আমার কথা, জনগণ যা করার তা করেছে। জনগণের সবচাইতে বড় অস্ত্র ঘৃণা। সে ঘৃণা এবং ক্ষোভ নীরবে জমেছে প্রচুর। এই ক্ষোভ এবং ঘৃণা সঠিক জায়গাটিকে উদ্দেশ্য করেই। জনগণ জানে সঠিক জায়গাটি কোথায়? জানে সবাই। সব জায়গায় ঢুকে আছে আপোস। মৌলবাদের সাথে, সাম্প্রদায়িকতার সাথে, ঘাতক দালালদের সাথে। এসব বিষয়ে রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরাও ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। এখনও পারছেন না। আমরা আশাবাদী। এ অবস্থার অবসান হবেই, কিন্তু মূল্যটা হয়ত অনেক বেশি দিতে হবে। আর তাতে রাজনীতিবিদদের প্রতি যদি কখনও গণপ্রতিরোধ আসে তাহলে অবাক হবার, ক্ষুব্ধ হবার কিছু থাকবে না।

বিকৃত পশুশক্তির প্রতি আমাদের ধিক্কার

বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী রমনা বটমূলের প্রভাতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারকীয় হামলা ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ স্তম্ভিত। এই পাশব সন্ত্রাসের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। বাঙালীর হাজার বছরের মানবিক সাধনার যে ধারা তার নামে আমরা ধর্মান্ধ বিকৃত পশুশক্তির প্রতি ধিক্কার জানাই। এই মানবতার অঙ্গীকার থেকে অমানবিক হীনতার বিরুদ্ধে সকল সচেতন নাগরিকের কাছে সমবেত সোচ্চার প্রতিবাদী জাগরণের আহ্বান জানাই।

বাংলা নববর্ষ আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। পহেলা বৈশাখ ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর জাতীয় উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল জাতি গঠনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল যেমন বাংলাদেশ তেমনি এই উৎসব। এদিকে দেশের সব জেলা ও জনপদে অসংখ্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সারা দেশে সার্বজনীন উৎসবের আয়োজন হয়। এই জাতীয় উৎসবের ঐতিহ্যবাহী মূল কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে হামলা স্বভাবতই নববর্ষের সকল অনুষ্ঠানের ওপর হামলার শামিল।

কেন এই হামলা? কারা সম্ভাব্য হামলাকারী?

এই বোমা হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যশোরে উদীচীর জাতীয় সম্মেলনে হামলা, পল্টনে সিপিবির সমাবেশে হামলা এবং ছায়ানটের নববর্ষের অনুষ্ঠানে হামলার মধ্যে যোগসূত্র থাকাই স্বাভাবিক। সাংবাদিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক কর্মীর ওপর হামলা ও তাদের হত্যার ও হুমকির ঘটনাগুলোও সম্ভবত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চলেছিল তার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীসহ গণবিরোধী সকল অপশক্তি নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। দেশ ও জাতি যখনই তার অভীষ্ট অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজ গঠনের বাতাবরণ তৈরিতে নিমগ্ন হয়, কিছুটা বা সফল হয় তখনই এই অপশক্তি মরিয়া হয়ে আঘাত হানতে থাকে। যত দুর্বল ও সীমিত হোক যখন পর পর দু'টি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার এক দশক পূর্তি হলো এবং আরও একটি নির্বাচন আসন্ন তখন সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক বিনির্মাণের প্রক্রিয়াই সবচেয়ে বেশি সঙ্কটাপন্ন হবে। অপশক্তির ছল ও চাতুরীর অভাব নেই। এ দেশের ধর্মপ্রাণ সরল মানুষকে তারা সবচেয়ে বেশি ধোঁকা দেয় ধর্মেরই নামে, ইসলামের নামে।

উদীচী, সিপিবি বা ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় হতাহত হয়েছেন নিরপরাধ-নিরীহ সাধারণ মানুষ। এই হত্যাকাণ্ড কিভাবে ইসলামসম্মত হতে পারে? আদৌ কোন ধার্মিকের পক্ষে কি এ কাজ সম্ভব? নিরীহ-নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা কি জেহাদ হতে পারে? এমনকি ভিন্নমতাবলম্বীকেও আঘাত করা ধর্মসম্মত নয়। এই গোপন প্রতিহিংসার রাজনীতি একমাত্র বিকারগ্রস্ত অধার্মিকেরই সাজে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দেশে সাধারণ দরিদ্র, শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের সারল্য ও অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মভীরুতাকে চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা ও রাজনীতিক সমাজে বিভেদ, সংশয় ও হিংসার বীজ বপন করে চলেছে। তারা প্রকাশ্যে বাঙালীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মনীষা এমনকি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় জীবনের পুরোধা ব্যক্তিত্ববৃন্দ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে, ইতিহাসের নানা মীমাংসিত ইস্যু নিয়ে অযাচিতভাবে অহেতুক বারংবার প্রশ্ন তুলে চলেছে। এসব সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয়ই নয়, অশ্রদ্ধা এবং বিতৃষ্ণা সৃষ্টিরও অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর সবই তারা করছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। তবে তাদের উত্তরোত্তর হিংস্র ও মরিয়া আক্রমণ থেকে বোঝা যায় তাদের কোন নীলনক্সা এ যাবত আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। বাঙালী নানা দোলাচল, ব্যর্থতা, ভীরুতা ও প্রাপ্তির মধ্যেও তার হাজার বছরের মানবতার ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেনি। তাতে বোধহয় অন্ধ পাশবশক্তির হিংস্র থাবা আরও প্রখর ও প্রকট হয়ে পড়ছে।

এইখানে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, যে কোন হত্যা ও অন্যায় যদি প্রতিকারহীন, বিচারবিহীনভাবে পার পেয়ে যেতে থাকে তাহলে শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তি মদত পেয়ে যায়। উদীচী সিপিবি ট্রাজেডির বিচার কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। শামছুর রহমান, কাজী আরেফ, রতন সেন, কালিদাস বড়ালসহ অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের বিচারেও তেমন অগ্রগতি নেই। আরও অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের হতাশাজনক পরিণতি কেবল সমাজে ন্যায়-অন্যায়, শুভাশুভ সত্য-অসত্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছে তা নয় অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও শক্তিশালী করছে। সেই সুযোগে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক বিপ্লবের ঘোরে আচ্ছন্ন অগণতান্ত্রিক গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করছে এবং সমাজের শুভ গণতান্ত্রিক ধারার ওপর আঘাত হেনে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে সক্রিয় হয়ে উঠছে। আমাদের দ্বিধা ও শৈথিল্য, দুর্নীতি ও আপোস, ক্ষমতার লোভ ও ক্ষুদ্রস্বার্থের ভেদবুদ্ধি তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও আসন্ন নির্বাচনকে তারা কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চায়।

আমরা ছায়ানট ট্রাজেডির হতাহত সকলের নিকটজনের কাছে সমবেদনা জানাই। সেই সাথে বলব, হতাশ হবার বা হাল ছেড়ে দেয়ার কোন কারণ নেই, কোন উপায়ও নেই। ত্রিশ লাখ শহীদের পবিত্র আত্মার অর্পিত দায়িত্ব আমরা ভুলতে পারি না; যে লক্ষ কোটি মানুষ বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীনতাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তব করেছে, স্বৈরাচারী বিকার তাড়িয়ে গণতন্ত্রের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তাদের ত্যাগকে অমর্যাদা করতে পারি না আমরা।

আমরা বুঝতে পারি সামনের দিন হয়ত আরও কঠিন হবে। হয়ত এই মরিয়া বন্য অশুভশক্তি আরও হিংস্রতা ও জিঘাংসা নিয়ে মানবতার চিরায়ত বাঙালী ধারার ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করবে। আপোস বা পিছু হটার চেষ্টা করে এই শক্তিকে দমন করা যাবে না। কারণ এ অন্ধ, তারও চেয়ে বড় কথা বিকারগ্রস্ত। পথ সামনেই, চলতে হবে সামনের দিকে। গণতন্ত্রের চলমান ধারাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অংশ করে তুলতে হবে, পরিণত করতে হবে ঐতিহ্যে, যেমনভাবে হয়েছে মানবতার ধারা।

আমরা পাকিস্তান আমলে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর আঘাতকে যেভাবে প্রতিহত করেছি এবং সকল অপশক্তিকে একাত্তরে যেভাবে পরাভূত করেছি সেভাবেই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।

হল্যান্ডে আইএসআইর হাসিনা হত্যার ষড়যন্ত্র ॥ রমনা বটমূলের ঘটনা তারই প্রথম ধাপ ?

অমিত বসু, কলকাতা থেকে আরব দেশগুলো পেশাদার খুনী বলে খ্যাত এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য নিয়োগ করেছে আইএসআই। রবিবার ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, পহেলা বৈশাখের উৎসবে রমনায় যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তা এই ষড়যন্ত্রেরই প্রথম ধাপ। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে নিরাপত্তার ফাঁকফোকরগুলো। উৎসবের আগের দিন স্নাইপার ডগ দিয়ে রমনায় যে তল্লাশি চালানো হবে, সে খবর তাদের কাছে আগেই ছিল। তাই তারা মাইন পুঁতে রাখার চেষ্টা করেনি। উৎসবের দিন আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণেই নাশকতা চালিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এইভাবেই নির্বাচনী জনসভায় হাসিনাকে হত্যা করা সম্ভব। দশ বছর আগে ১৯৯১ সালের ২১ মে চেন্নাই থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে শ্রী পেরুমবুদুরে নির্বাচনী জনসভায় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েই হত্যা করা হয়। কঠোর নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে সাংবাদিকের ছদ্মবেশে তামিল টাইগার জঙ্গীরা এই বিস্ফোরণ ঘটায়। শেখ হাসিনা হত্যা ষড়যন্ত্রে এই ধরনের ব্যবস্থার কথাই ভাবা হচ্ছে। তবে ষড়যন্ত্রের টেবিল এবার কলকাতা থেকে উড়ে চলে গেছে হল্যান্ডের ছোট্ট শহর ব্রেদায়। সেখানেই একটি বাংলাদেশী রেস্তরাঁয় নিয়মিত বৈঠক চলছে বিষয়টি পাকা করতে। রেস্তরাঁটির মালিক একে মহিউদ্দিন। তিনি বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান হত্যার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। তাঁর কাজে খুশি হয়ে সামরিক কর্তারা তাঁকে হেগে বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ দেন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর হল্যান্ডে তখনকার রাষ্ট্রদূত তৌফিক আলীর নির্দেশে তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। এবং রেস্তরাঁটি চালু করেন। আইএসআইর এজেন্ট হিসাবে এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছে পাক সামরিক বাহিনীর কর্নেল সোহেব নাসির। তবে গোয়েন্দা দফতর মনে করছে, এটি তাঁর আসল নাম নয়।

পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল পারভেজ মোশারফের সঙ্গে শেখ হাসিনার সম্পর্ক আরও তিক্ত হতে শুরু করেছে ঢাকা থেকে পাক উপরাষ্ট্রদূত ইরফান রাজাকে ইসলামাবাদে ফেরত পাঠানোর পর। তিনি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মন্তব্য করায় বাংলাদেশ সরকার এই ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু মোশারফ তাতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

হল্যান্ডের রেস্তরাঁয় শেষ বৈঠক হয়েছে ৭ মার্চ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল নাসির ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা। তার পর তাদের মধ্যে আর বৈঠক না হলেও ফোনে কথাবার্তা চলছে। ইসরাইলী গোয়েন্দারা আইএসআইর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার রিয়াজের সঙ্গে হল্যান্ডে ষড়যন্ত্রকারীদের ৯ মার্চের কথোপকথন টেপ করে বাংলাদেশ সরকারকে পাঠিয়েছে।

পহেলা বৈশাখের উৎসবের দিন পরিকল্পিতভাবেই সব সংবাদপত্র অফিস বন্ধ রাখার ব্যবস্থা হয়। উৎসবের খাতিরে প্রস্তাবটি এমনভাবে তোলা হয় যে, সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলো বুঝতেই পারেনি এর পেছনে এত বড় ষড়যন্ত্র আছে। লাগাতার হরতালে আইএসআই হাসিনা সরকারকে অচল করে দেবার সুযোগ পেয়েছে। তাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে হাসিনা সরকারকে হেয় করতেও তাদের অসুবিধা হবে না। তখন হাসিনাবিরোধী স্রোতে তাঁকে হত্যা করাও সহজ হবে এবং নির্বাচন বন্ধ করে গণতন্ত্রকেও হত্যা করা সম্ভব হবে।

ফরমান জারি করেও খাজনা ট্যাক্স আদায় করা যায়নি

আহমেদ নূরে আলম একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে যে সর্বাত্মক অসহযোগ শুরু হয়েছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পনের দিন পর্যন্ত বাঙালীকে তা থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। কোন স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা-সহযোগিতা পায়নি তারা। আর তা পেতে হানাদাররা বাঙালীর ওপর নানা জোরজবরদস্তি করেছে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সংবাদপত্রে। জনগণের সহযোগিতা না পেলে অসীম ক্ষমতাশালীর যে কি করুণ অবস্থা হয় তা দেখা যায় পাকিস্তানীদের অসহায়তায়।

ধরা যাক খাজনা, ট্যাক্স, কর আদায়ের বিষয়টি। এটি হচ্ছে সরকারের অস্তিত্ব ও ক্ষমতার স্বীকৃতির প্রতীক। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের আহ্বানে স্বাধীনতাকামী বাঙালী সেই যে সকল প্রকার কর, খাজনা, ট্যাক্স, ফী পরিশোধ বন্ধ করে দিয়েছিল তা এমনকি ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, নির্মম অত্যাচারের পরও দিতে শুরু করেনি।

কর, খাজনা আদায়ে হানাদার সরকারকে সামরিক ফরমান পর্যন্ত জারি করতে হয়েছিল। একাত্তরের ১৬ এপ্রিলের সংবাদপত্রগুলোর একটি প্রধান খবর ছিল "জমির খাজনাসহ সকল প্রকার কর পরিশোধের নির্দেশ"। খবরের বিষয়বস্তু ছিল– গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট পরিশোধযোগ্য সকল খাজনা ও পাওনা ছাড়াও বৈধ আইনসঙ্গতভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট সকল প্রকার ট্যাক্স, ফী, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় রেট ইত্যাদি "নির্দিষ্ট দিবসে" পরিশোধ করতে হবে (দৈনিক আজাদ)। অসহযোগে পৌরসভা, টাউন কমিটি ও ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোও কর, খাজনা, টোল ও ফী আদায়ও বন্ধ করে দিয়েছিল। ১৬ এপ্রিল এ স্থানীয় সরকারগুলোকে কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের স্বাভাবিক নাগরিক ও উন্নয়ন কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং কর ও খাজনাদাতাদের তাদের কর ইত্যাদি প্রদান করারও অনুরোধ করা হয় (দৈনিক পাকিস্তান)।

জমির কর, খাজনাই নয় জনগণ বিভিন্ন সার্ভিসের বিলও পরিশোধ বন্ধ করে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। এ দিনের আর একটি খবর ছিল–" বৈদ্যুতিক বিল রেয়াতের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে"। গ্রাহকদেরকে বিল পরিশোধের এ খবরে বলা হয়েছিল, ১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে যে বিলের রেয়াতের সীমা ছিল তা বাড়িয়ে ২৪ এপ্রিল করা হয়েছে (দৈনিক পাকিস্তান)। দৈনিক পূর্বদেশ ছেপেছিল "ডেমারেজ মাফ" শীর্ষক একটি খবর। সামরিক ফরমানের উদ্ধৃতি দিয়ে এ খবরে বলা হয়েছিল, গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক যাতায়াত ও যানবাহনের অসুবিধার জন্য বন্দরে ও রেলওয়ে স্টেশনে যে সমস্ত মাল পড়ে রয়েছে তার ডেমারেজ মাফ করে দিয়েছেন। এ সুযোগ ১৫ মে পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অসহযোগে বাংলাদেশ কেমন অচল হয়ে গিয়েছিল তা বোঝা যায় দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে। এতে বলা হয়েছিল, টিউবওয়েল ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত ঠিকাদাররা ২১ এপ্রিলের মধ্যে কাজ শুরু না করলে তাদেরকে বরখাস্ত করা হবে। এরা মার্চের অসহযোগের সময় কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন! কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোর পত্রিকা উল্টালে দেখা যায়, সরকার ২৮ এপ্রিল এক হ্যান্ডআউটে ঠিকাদারদের কাজ শুরুর আহ্বান জানিয়ে তা শেষ করার জন্য ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বাড়িয়েছিল।

কর, খাজনা পরিশোধ পরিস্থিতির এ চিত্র থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রবল শক্তিশালী সামরিক সরকার প্রকৃতপক্ষে কত অসহায় ছিল। স্বাধীনতাকামী বাঙালী জাতি বিন্দুমাত্র মাথা নত করেনি বলে বলপ্রয়োগ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না।

মুক্তিকামী জনগণের সশস্ত্র বিরোধিতাও যে অব্যাহত ছিল তা ১৬ এপ্রিলের কাগজে দেখা যায়। এ দিনের প্রধান খবর ছিল– কাপ্তাই পানিবিদ্যুত কেন্দ্র ও আশুগঞ্জ বিদ্যুত কেন্দ্র "দুষ্কৃতকারী"রা প্রায় উড়িয়ে দিয়েছিল। অবশ্য স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানীরা দুষ্কৃতকারী, অনুপ্রবেশকারী ও নাশকতাকারী বলে অভিহিত করত। খবরে উভয় ক্ষেত্রেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপে প্রকল্প দু'টি রক্ষা পায়। আশুগঞ্জ বিদ্যুত কেন্দ্রে ডিনামাইট "অনুপ্রবেশকারী"রা বসিয়েছিল। অনুপ্রবেশকারীদের তিনটি স্পীডবোট মেঘনা নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল। এর আগের দিন ভৈরব সেতুতে মুক্তিযোদ্ধারা ডিনামাইট বসিয়েছিল বলে জানিয়েছিল পাকি কর্তৃপক্ষ।

দিনটি ছিল শুক্রবার। বায়তুল মোকাররমে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়েছিল।

নূরুল আমিনের নেতৃত্বে অধ্যাপক গোলাম আযমসহ শান্তি কমিটির ১৬ শীর্ষ নেতা দেখা করেছিল টিক্কা খানের সাথে। তারা যে কোন মূল্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিল।

লাহোরে পিপলস পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরি সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করে, শেখ মুজিবের লক্ষ্য ছিল বিচ্ছিন্ন হওয়া। এর আগের দিন ১৫ এপ্রিল পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে ইয়াহিয়া সরকারের প্রশংসা করে বলে, সরকার ন্যায়সঙ্গত কারণেই আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করেছে।

যদিও সংবাদপত্র দেখে কারও পক্ষে এটা বোঝা কঠিন ছিল না যে, কোন কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না, তা সত্ত্বেও পাকিদের গোয়েবলসীয় প্রচারণা থেমে ছিল না। নয়াদিল্লীর বরাত দিয়ে পূর্বদেশ পত্রিকায় একটি খবরে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসায় এবং পিকিংয়ের দৃঢ় সমর্থনের ফলে নয়াদিল্লীতে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই চরম নৈরাজ্যের মধ্যে ভারত "তথাকথিত বাংলাদেশের মিথ্যা ও অস্তিত্বহীন সরকারের" কথাও ঘোষণা করতে পারে বলে কূটনীতিক মহল ধারণা করছেন।

ইতিহাস বলে, পাকিস্তান যে দেশকে "তথাকথিত" বলে অভিহিত করেছিল, সে দেশটি – "বাংলাদেশ"– বাস্তবতা লাভ করেছিল আর মাত্র আট মাস পর।

নিহতদের নাম পরিচয়

মেডিক্যাল রিপোর্টার ॥ রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে নিহত নয় ব্যক্তির মধ্যে সাত জনের পরিচয় পাওয়া গেছে, দু'জনকে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ শনাক্ত করতে আসেনি। অজ্ঞাত দু'জনের লাশ মর্গেই পড়ে আছে। বাকিদের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে আত্মীয়স্বজনের কাছে।

পরিচয় পাওয়া গেছে যে সাতজনের তাদের মধ্যে দু'জন চাচাতো ভাই। নাম রিয়াজ (২৫) এবং মামুন (২০)। রিয়াজের পিতার নাম শামসুল হক। বাসা ১/৮ কলেজ গেট, মোহম্মদপুর। তিন ভাই দু'বোনের মধ্যে বড় রিয়াজ ওষুধ ব্যবসায়ী ছিলেন। মামুনের পিতার নাম আবুল কাশেম গাজী। ছয় ভাইয়ের মধ্যে পঞ্চম মামুন বেকার ছিলেন। থাকতেন শ্যামলী আদাবর এলাকার এক মেসে। দু'জনেরই গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল থানার কাছিপাড়া। শনিবার বিকালে রিয়াজের বেয়াই জাহিদুল ইসলাম তাদের লাশ শনাক্ত করেন। মামুনের বড় ভাই মাসুদ গাজীর কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যালে মারা যান অসীম কুমার সর্দার (২৬), পিতা মৃত অবণী ভূষণ সর্দার। বাড়ি পটুয়াখালী সদর থানার ছোট বিগাই গ্রামে। দু'ভাই দু'বোনের মধ্যে অসীম ছিলেন বড়। তিনি ছিলেন শ্যামলী পরিবহনের ম্যানেজার। ঘটনার দিন সকালে স্ত্রী অপু রানী এবং শ্যালক সজীবসহ তিনি রমনায় যান। বোমায় সজীবও আহত হয়েছেন। মৃতের বোন অর্চণা রানী সরদার অসীমের লাশ শনাক্ত করেন।

ঘটনাস্থলেই নিহত হন গার্মেন্টস শ্রমিক আবুল কালাম আজাদ (৩৪)। তিনি নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোডের 'ফ্যান্টম এ্যাপারেলস'-এ কাজ করতেন। তাঁর পিতার নাম সিরাজুল ইসলাম। গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের হরিশপুরে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আজাদ ছিলেন সবচেয়ে ছোট। মৃতের চাচা শাহ আলমের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। নিহত ইমরান হোসেন (২৪) ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। তিনি নিউ মার্কেটে 'ইউনাইটেড টেইলরস এ্যান্ড ফেব্রিকস' নামের এক কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। বাড়ি হাজারীবাগের নবীপুর লেনে। তাঁর পিতার নাম কাশেম আলী খলিফা। গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার বিরামকান্দিতে। তিনি দুই ভাই পাঁচ বোনের মধ্যে পঞ্চম। ঘটনার দিন সকালে চার/পাঁচ বন্ধুসহ তিনি রমনায় যান। তাঁর পকেটে থাকা কার্ড দেখে পুলিশ তাঁর বাসায় খবর দেয়।

ঘটনাস্থলেই নিহত ইসমাইল হোসেন (২৪)-এর পিতার নাম আবুল কালাম। গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার হরিরামপুরে। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে ইসমাইল বড়। হাজারীবাগে এক ট্যানারি কারখানায় তিনি কাজ করতেন। তাঁর খালাত ভাই সালাউদ্দিন লাশ শানাক্ত করেন।

নিহত অপর ব্যক্তি জসিম উদ্দিন (২০) কে পুলিশ সন্দেহ করছে বোমা বহনকারী হিসাবে। সে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইসলামিক ইতিহাস বিষয়ের ১ম বর্ষের ছাত্র ছিল। তিন ভাইয়ের মধ্যে জসীম মেঝ। পিতার নাম এনায়েত হোসেন। গ্রামের বাড়ি বরগুনার বামনা থানার ভাইজোড়ায়। ঢাকায় সে থাকত ডেমরার মাতুয়াইলের দক্ষিণপাড়ায়। মৃতের মামা মহিউদ্দিন আহম্মদ তার লাশ শনাক্ত করেন। চাচাতো ভাই মৌলানা মতিউর রহমানের কাছে জসিমের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝুমুর কোথায়?

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঝুমুর কোথায়? রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে এসেছিল ঝুমুর। কিন্তু রবিবার পর্যন্ত তার খোঁজ নেই। ঝুমুরের জন্য তার মা আহাজারি করছেন। বড় ভাই ও দুলাভাই হাসপাতাল ও পরিচিতজনদের বাড়ি খুঁজেছেন। নিহত-আহতদের তালিকায় ঝুমুরের নাম নেই। কোথাও তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঝুমুরের পুরো নাম নুসরাত জাহান (২০)। সে লালমাটিয়া কলেজে এ্যাকাউনটেন্সিতে অনার্স পড়ছে। উদীচীর একজন কর্মী। পহেলা বৈশাখ শনিবার ঝুমুর মিরপুর সেনপাড়ার বাসা থেকে রমনার বটমূলে আসে অনুষ্ঠানে। বোমা বিস্ফোরণের পর তার বড় ভাই মোঃ জহিরুল হক তাঁর খোঁজে বাড়ি থেকে ছুটে আসেন। সর্বত্র ঝুমুরের খোঁজ করেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে দেখেন ঝুমুর যায়নি। রবিবার সারা দিন তারা ঝুমুরকে খুঁজেছেন। বিকালে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের সি ব্লকের দশতলায় দেখা হয় ঝুমুরের ভাই জহিরুল হক ও দুলাভাই একেএম হান্নানের সঙ্গে। তাঁরা জানান, সব হাসপাতালে ঝুমুরকে খুঁজেছি, পাচ্ছি না। আহত-নিহতদের তালিকাও দেখেছি। ঝুমুরের জন্য আমরা সবাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছি।

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী অপহরণ ॥ ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রামের বাণিজ্যপাড়া চাক্তাইয়ের ব্যবসায়ী ও রাইস মিল মালিককে একদল সন্ত্রাসী কৌশলে অপহরণ করেছে। সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ হিসাবে দাবি করছে ৫০ লাখ টাকা। অপহৃতের পরিবার বা আত্মীয়স্বজন গোপন সমঝোতার মাধ্যমে ঘটনার সমাধানে তৎপর রয়েছে। ফলে কোন মামলা, জিডি কিছুই হয়নি পুলিশের কাছে। অপহৃত ব্যবসায়ীর নাম আবদুল আলীম (৪২)। তিনি চাক্তাইয়ের হক ভাণ্ডারি রাইস মিলের মালিক। তার বাড়ি চন্দনাইশে। গত শুক্রবার রাত অনুমান সাড়ে ৮টায় তিনি ও তাঁর ম্যানেজার চন্দনাইশগামী একটি মাইক্রোবাসে ওঠেন কর্ণফুলী ব্রিজ এলাকা থেকে। মাইক্রোবাসটিতে যাত্রীবেশী ক'জন সন্ত্রাসী ছিল। মাইক্রোবাসটি কর্ণফুলী ব্রিজ অতিক্রম করে জেলার সীমানায় পৌঁছার পর সন্ত্রাসীরা গাড়ি থামিয়ে ম্যানেজারকে মারধর করে নামিয়ে দেয়। পরে আবদুল আলীমকে অপেক্ষামান একটি প্রাইভেট কারে উঠিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। সেখান থেকে এখন টেলিফোনে তাঁর পরিবারের কাছে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ হিসাবে দাবি করা হচ্ছে। এ ঘটনা শুক্রবার রাতেই সিএমপির ডিসি (নর্থ) অবহিত হন। বারে বারে প্রচেষ্টা চালিয়েও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পুলিশী সাহায্য গ্রহণে রাজি করাতে পারেননি। আবদুল আলীমের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানানো হয়েছে, তাদের ভয় হচ্ছে, পুলিশকে জানালে অপহৃতকে মেরে ফেলা হবে। চাক্তাই এলাকাটি বাকলিয়া থানার অধীন। কিন্তু অপহরণস্থলটি জেলা পুলিশের অধীন। এরপরও বাকলিয়া থানা পুলিশ নিজ উদ্যোগে একটি জিডি করেছে। ডিসি (নর্থ) জনকণ্ঠকে জানান, এরপরও ডিবিসহ পুলিশ সদস্যবা তৎপর রয়েছে। সোর্স লাগানো হয়েছে। খোঁজ পেলেই চলবে উদ্ধার অভিযান।